#আমি পদ্মজা পর্ব ৬৬

_____
“সেই ঝড়ের সন্ধ্যেতে। যেদিন আমির আর তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল” বাক্য দুটি পদ্মজার নিঃশ্বাস থামিয়ে দিল। রিদওয়ান বিছানা ছেড়ে চেয়ার টেনে বসলো। বললো,’ আমির সারাবছরই ঢাকা থাকে। শুধু বর্ষাকাল আর শীতকালে গ্রামে আসে। সেসময় বর্ষাকাল ছিল। মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে। সেই আনন্দে আমির আমার সাথে তাস খেলে। বলে, যদি ওকে আমি হারাতে পারি আমি যা চাইবো তাই দিবে। একটু প্রশংসা করি,আমির শয়তান হলেও কথা দিয়ে কথা রাখার অভ্যাসটা ভালোই ছিল। আমার সৌভাগ্য, আমির সেদিন হেরে যায়। আমাদের আটপাড়া গ্রামের মেয়েদের আমরা কখনো শিকার করি না। এটা আমাদের নিয়ম। নিজের গ্রামের মেয়ে হারালে

দূর্নাম হবে বড় চাচার। কারণ তিনি মাতব্বর। আটপাড়ার কোনো মেয়ে আজও আমাদের হাতে পড়েনি। তোমাকে আমি স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি। বিশ্বাস করো,আমি তোমাকে যেদিন দেখি সেদিন রাতে ঘুমাতে পারিনি। আব্বাকে বলছি,তোমাকে এনে দিতে। তিনি দিলেন না। আটপাড়ার মেয়ে তুলে আনা যাবে না! কড়া নিষেধ। তারপর অনুরোধ করেছি, যাতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। তখন বড় চাচা বললেন, তোমার মায়ের কথা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের অনেকের কাছে শুনেছেন, তোমার মা নাকি মেয়ে বিয়ে দিবেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বনেদি ঘরের ছেলেরাও নাকি এসেছে বিয়ের জন্য তাও তিনি বিয়ে দিতে রাজি হননি। কিন্তু আমারতো তোমাকে লাগবেই। তোমার রূপ এমনই যে,সারাজীবন ভোগ করলেও পানসে লাগবে না।’

শেষ কথাটি শুনে রাগে পদ্মজার কপালের চামড়া কুঁচকে যায়। তবে টু শব্দ করলো না। রিদওয়ান বলছে,'আমার এই বাড়ির প্রতি,এই পাতালঘরের প্রতি লোভ অনেক আগে থেকে। তবুও আমি সেসবের কিছু না চেয়ে আমিরের কাছে তোমাকে চেয়েছি। কতোটা পছন্দ করেছি ভাবো একবার? ভাবো পদ্মজা। একটু ভাবো।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে কাতর চোখে তাকালো। তারপর চোখেমুখে ক্রোধ এনে বললো,'কিন্তু হলো কী? নিজে পছন্দ করে ফেললো। আমির আমার জন্য তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমি জানতাম,তোমার আম্মা বাড়িতে নেই। তাই এরপরদিনই আমির তোমাদের বাড়িতে যায়। কথা দিয়েছিল,এশার আযানের আগেই আমার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিবে। ধ-রক্তের বি-থ্রি ঘরে আমি

অপেক্ষায় ছিলাম। মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করেছি। তারপর অন্দরমহলে চলে যাই। গিয়ে শুনি,আমির বড় চাচাকে হুমকি দিচ্ছে,তোমার সাথে বিয়ে না দিলে নাকি কাজ ছেড়ে দিবে। যদিও সবাই জানি,আমির কোনোদিন তার পেশা ছাড়বে না। তাও বড় চাচা আমিরকে অসন্তুষ্ট রাখতে চান না। তাই কথা দিলেন তোমার সাথেই বিয়ে হবে। যেভাবেই হউক। আমিরের সাথে আমার তর্ক হয়। আমাকে তখনই আদেশ দেয়া হয়, ছইদকে খুন করতে হবে। ছইদ আমিরের সাথে বেয়াদবি করেছে। যা আমিরের গায়ে লেগেছে। ও চায় না ছইদ আর বেঁচে থাকুক। আমিরের আদেশ পালন করতেই হয়। কিন্তু সেদিন আমি শুনিনি। তখন বড় চাচা বললো,'পদ্মজা সমাজের কাছে আমিরের বউ হলেও,ঘরে তোর বউও হবে। আমি তার ব্যবস্থা করব,আমিরের সাথে কথা বলব। '

আমাকে আশা দেওয়া হয়। তাই ছইদকে সরিয়ে দেই। সব কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু অবাক কান্ড কি জানো? তোমার মাও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা এতো ভয়ংকর আগে বুঝিনি! মেয়ে মানুষ হয়ে কীরকম ভাবে যে নেশাগ্রস্থ দুটি মানুষকে জবাই করেছে তুমি ভাবতেও পারবে না!'

রিদওয়ান থামলো। সে অবাকচোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে জানে এই ঘটনা। চিঠিতে পড়েছে। রিদওয়ান বললো,'তারপরদিন সালিশে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলো। তোমার আম্মাও রাজি হয়ে গেলেন। বলেছি না? আমির দুনিয়ার সব সুখ নিয়ে জন্মেছে। তোমার আম্মা আমাকে চিনতেন না। কখনো দেখলেও বা নাম শুনলেও মুখ মনে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্তে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেন। বড় চাচা সমাজের

চোখে কতোটা মহান সেটা তুমিও জানো। দুই মাস অন্তর,অন্তর দান করেন। সবার অভাব দূর করেন,চিকিৎসা করান। উনার ছেলের বউ মানে অনেক কিছু! তোমার আম্মাতো আর ভেতরের খবর জানতেন না। সে যাই হোক পরের কথা বলি। আমির যখন শুনলো, তোমার আম্মা দুটো খুন করেছে, ও চিন্তায় পড়ে যায়। আমির ধূর্তবাজ, চালাক। ও মানুষ চিনে। ও তাৎক্ষণিক বুঝে গেল, তোমার আম্মা জটিল মানুষ। তাই আমাকে নিষেধ করলো,বিয়ে বাড়িতে আমার মুখ না দেখাতে। চিনে গেলে সমস্যা হবে। আমিরের সাথে তাল মিলিয়ে বড় চাচাও নিষেধ করলো। আমি তো-

পদ্মজা মাঝপথে প্রশ্ন করলো,'আপনি এই গ্রামের ছেলে! আর আম্মাও এই গ্রামের মেয়ে,বউ। তারপরও আপনাকে চিনতেন না?'

‘ওইযে বললাম,কখনো হাওলাদার বাড়ির ছেলে হিসেবে দেখলেও মনে নেই। নয়তো নাম জানতেন মুখ চিনতেন না। তাছাড়া,আমাকে সত্যি অনেকেই চিনে না। নাম জানলে মুখ চিনে না। মুখ চিনলেও,হুট করে দেখে ধরতে পারে না। সবসময় এখানে থাকি। অন্দরমহলে থাকি। রাতে বের হই। ট্রলারে থাকি। এটা খুব সহজ ব্যাপার। তোমার আম্মা চিনতেন না বললে বেমানান লাগবে না। আর শুনেছি, তোমার আম্মা নাকি সমাজের দিকে চোখ দিতেন না তেমন। নিজের সংসার আর তিন মেয়েকে নিয়েই থাকতেন।’
কথাগুলো অবহেলার স্বরে বলে রিদওয়ান থামলো। পদ্মজা কিছু বললো না। রিদওয়ান ভ্রুকুঞ্চন করে বললো,’কোথায় যেন ছিলাম?’
পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান মনে করার চেষ্টা করলো। মনে পড়তেই আবার বলা শুরু

করলো। আমিরের কথামতো সে হেমলতাকে মুখ দেখায়নি। যায়নি ও বাড়িতে। বিয়ের দুইদিন আগে মেয়েগুলোকে ঢাকা চালান করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আলমগীর আমিরের কথামতো পাচার করে দেয় বিদেশে। মৃত মেয়েগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় বড়-বড় নদীতে। একটা মেয়ে রয়ে যায়। সে মেয়েটিকে পদ্মজা আর আমিরের বিয়ের আগের দিন রাতে হত্যা করা হয়। তারপর আমিরের কথামতো, হাবলু আর রিদওয়ান চলে আসে হাওড়ে। অন্দরমহলে তখন আমিরের গায়ে হলুদের উৎসব চলছিল। হাওড়ে তখন তীব্র স্রোত। বাড়ি ফেরার তাড়াও ছিল। আবার মেয়েটি অনেক দূরের। তাই হাবলু মেয়েটিকে নদীর শেষ মাথায় ও হাওড়ের শুরুতে ফেলে দেয়। তখনই খেয়ালে পড়ে,আরেকটি নৌকা। যেখানে মোড়ল বাড়ির পরিবার ছিল। রিদওয়ান ট্রলারের ভেতর ছিল। সে হাবলুকে তাড়া দেয়

দ্রুত ট্রলার ঘুরাতে। তারপরের কাহিনি পদ্মজার জানা। পুরোটা শুনে পদ্মজা অবাক হয়ে যায়। সে হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলো,'আর...আর হানিফ মামার ব্যাপারটা?'

রিদওয়ান খুব বিরক্তি নিয়ে বললো,'এসব ছোটখাটো ব্যাপার। ওই শালা আমাদের সাথেরই লোক ছিল। তারপর আধিপত্য দেখানো শুরু করে। টাকা চায় অনেক। আমিরের উপর কথাবলা শুরু করে। হুমকি দেয়। তার চাহিদা বেড়ে যায়। অনেকদিন সহ্য করার পর একদম উপরে পাঠিয়ে দেই।' রিদওয়ান হাসলো। যেন খুব মহৎ একখানা কাজ করেছে। তারপর আবার বললো,'প্রান্তর আব্বা আর আবদুল এদের নিয়েও প্রশ্ন করবে নাকি? এদের কথা জেনে তোমার লাভ নেই। দুইজনই সব জেনে ফেলার কারণে মরেছে। সহজ হিসাব। প্রান্তর বাপ আমিরের

হাতে,আবদুল আমার হাতে। এসব বাদ দেও। আমরা আমিরের কথাতে যাই। তোমাকে শুধু আমিরের গল্প শোনাব।’

রিদওয়ান কাছে কথাগুলো যেন কত স্বাভাবিক! যেন মশা মারার গল্প বলছে! পদ্মজা ভীষণ অবাক হচ্ছে। এই হাওলাদার বাড়ির আঁচ তার গায়ে এতো আগে থেকেই লেগেছিল!
হানিফকে খুন করতে গিয়ে তার মা খালি হাতে ফিরে আসে। তারপরদিন হানিফের লাশ পাওয়া যায়। অথচ,তার মা খুন করেনি। প্রান্তর বাপ খুন হয়। প্রান্ত মুন্না থেকে প্রান্ত হয়ে উঠে,তাদের ভাই হয়ে উঠে। আমির শিকার করতে এসে তার প্রেমে পড়ে যায়। বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের আগেরদিন রাতে নদীতে লাশ পাওয়া যায়। তারপর অবশেষে বিয়ে হয়! সবকিছু এক সুতোয় গাঁথা! এ কেমন যোগসূত্র! পদ্মজার মাথা ভনভন করতে থাকে। এতদিন

একটা চক্র তার আশেপাশে শব্দ তুলে ঘুরঘুর করছিল। সে শব্দ ঠিকই শুনেছে তবে তার উপস্থিতি ধরতে পারেনি। রিদওয়ান বললো,'বিয়ের দিন রাতে বড় চাচার কথায় ভরসা রেখে তোমাকে ছুঁয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,আমির কিছু বলবে না। কিন্তু হলো কি? সে তো তোমার রূপে একেবারে কুপোকাত।
তারপরের ঘটনাও বোধহয় জানো। আমির আষ্টেপৃষ্ঠে তোমাকে আগলে রাখা শুরু করে। একসময় বিভিন্ন কার্যকলাপে তোমার সন্দেহ হতে থাকে। এই ব্যাপারটা আমিরকে চিন্তায় ফেলে দেয়। পাহারাদার বাড়িয়ে দেয়। তোমার উপর নজর রাখার জন্য রেখে দেওয়া হয় লতিফাকে। তাই আমিরের সাজানো দেয়াল ভেঙে পৌঁছাতে পারোনি পাতালঘরে। তোমার আম্মা নাকি চোখের দৃষ্টি দেখে,মানুষ চিনতে পারেন? কার মুখ থেকে জানি আমির

শুনেছিল। ব্যাপারটাকে গুরুতর ভাবে নিয়ে নেয় আমির। সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। তোমার আম্মাকে নিয়ে একটু ভয়েও ছিল। মহিলার চাহনি,কথাবার্তা খুব বেশি ধারালো আর সজাগ। আমির পরিকল্পনা করে,তোমার আম্মার গলাটা আলাদা করে দিবে। মাঝপথে কাঁটা রাখা ভালো না। এটা কিন্তু আমার কথা না। আমিরের কথা।'

রিদওয়ান পদ্মজার মুখের ভঙ্গি দেখার জন্য তাকালো। পদ্মজার চোখ দুটি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। আমির হাওলাদার তার মাকে খুন করতে চেয়েছিল! রিদওয়ান পদ্মজার মেজাজ আঁচ করতে পেরে বললো,' এমনকি খুন করতেও গিয়েছিল।'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। তার চোখে জল টলমল করছে সেই সাথে লাল হয়ে উঠেছে। রিদওয়ান বললো,'ঘটনাটা তোমার বিয়ের

কয়দিন পরের। সেখানে গিয়ে জানতে পারলো,তোমার আম্মার কি এক রোগ হয়েছে। মরে যাবে,সব ভুলে যাবে। সম্ভবত তোমার আম্মা তোমার আব্বার সাথে কথা বলছিল। আমার ঠিক মনে নেই। অনেক আগের ঘটনাটা তো। তাই আমির তার পরিকল্পনা বাদ দিল। কয়দিন পর তোমাকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে । এখন আর এসব করে লাভ নেই। কয়দিন পর এমনিতেই মরে যাবে। তবে যদি না মরতো তাহলে কিন্তু আমিরই খুন করতো। এই হলো তোমার সোহাগের স্বামী।’

রিদওয়ানের ঠোঁটে তিরস্কারের হাসি। কি যে আনন্দ হচ্ছে তার! শুধু পদ্মজা জানে তার কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে। আমিরের প্রতি রাগ,ঘৃণা নিঃশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এই মুহূর্তে যদি তার হাত,পায়ের বাঁধন খোলা থাকতো তবে সে রিদওয়ানের এই গা জ্বালা হাসি চিরতরে বন্ধ

করে দিয়ে,আমিরকে শেষ করে দিত।
রিদওয়ান হইহই করে উঠলো,' আরে আরো বাকি আছেতো। থেমে গেলেতো চলবে না। যেদিন তোমার মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল দিল,সেদিন তোমার আম্মা প্রথম আমাদের বাড়িতে আসেন। আর আমাকে দেখে চিনে ফেলেন। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মহিলার মস্তিষ্ক নাড়া দিয়ে উঠে। তিনি তোমাকে নিয়ে ভয় পান বোধহয়। আমি রাতে দ্বিতীয় তলায় হাঁটছিলাম রুম্পা ভাবির ঘরটা নজরে রাখার জন্য। ধীরে,ধীরে হাঁটছিলাম তাও সেই শব্দ তোমার মায়ের কানে চলে যায়। তিনি বেরিয়ে আসেন। আমাদের কথা হয়। উনি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভেঙে পড়েন। মা হিসেবে এমনটাই হওয়ার কথা। শেষ রাতে আমি আর আমির ছাদে ছিলাম। আচমকা দেখি, তোমার আম্মা জঙ্গলের ভেতর ঢুকছেন। কত সাহস! মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রথমবার এসেই সন্দেহ করে

পুরো বাড়ি ঘুরা শুরু করেছেন! বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। জঙ্গলের ভেতরই আমাদের সব। তখন এতো নিরাপত্তা ছিল না। তাই আমির ছুরি নিয়ে তোমার মায়ের পিছু ধাওয়া করে। লক্ষ্য ছিল,যখনই তোমার আম্মা টের পাবে কিছু। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তোমার আম্মা পুরো জঙ্গল ঘুরেও কিছু ধরতে পারেননি। এটা তোমার আম্মার ভাগ্য! নয়তো ওখানেই মরতে হতো। এখানেই কিন্তু সব শেষ নয়। তোমরা ঢাকা যাওয়ার পর উনি আরো দু-দুবার লুকিয়ে এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। দুইবারই হাবলু উনার পিছু নিয়েছে। আমি আমিরকে চিঠি লিখি। তখন আমির জানালো,আরেকবার তোমার আম্মা যদি এখানে আসে সঙ্গে সঙ্গে যেন মৃত্যু উপহার দিয়ে দেই। কিন্তু তিনি আর আসেননি। কিছু না পেয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন,এখানে কিছু নেই। এই বাড়িতে গোপন কিছু নেই। নয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছু একটা

হবে জানি না অতো। তোমার মায়েরও ভাগ্য ভালো! দুইবার মেয়ের জামাইয়ের হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি,দুইবার হাবলুর মতো জাত খুনির হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি। উনার মৃত্যুটাই লেখা ছিল রোগে। সে যাই হোক। দেখো, আমির জানতো তোমার মা তোমার কতোটা প্রিয়। তবুও কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখেছে। তোমার মাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন মানুষকে তুমি ভালোবেসেছো! রাগ হচ্ছে না ভেবে?'

পদ্মজা নির্বাক,বাকহারা। তার ভেতরে বিন্দুমাত্র ভালোবাসার অনুভূতি যেন নেই। রিদওয়ান আবার বলতে শুরু করলো,'আমির তোমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আর বোনের বিয়ের জন্য এখানে আসেনি। তুমি ভেবেছো, সব কাজকর্ম ফেলে শুধু তোমার মন রাখতে এসেছে। এটা মিথ্যা। ও এখানে এসেছে বিপদে

পড়ে। কুয়েত থেকে বড় অংকের টাকা অগ্রীম নিয়েছে ছয় মাস আগে। বিনিময়ে ত্রিশটা মেয়ে দিতে হবে। মেয়েগুলোর গায়ে একটু দাগও থাকতে পারবে না। মেয়ে দেয়ার কথা ছিল এক মাস আগেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি,পারিনি। সব মানুষ চালাক হয়ে গেছে। এমন কখনো হয়নি। এইবার সব ওলটপালট হয়ে গেছে। আমির এর উপর চাপ আসতে থাকে। ও টাকাগুলোও খরচ করে ফেলছে। কী করছে কে জানে। কুয়েত থেকে হুমকি এসেছে,আরো এক মাসের মধ্যে ত্রিশটা মেয়ে দিতে না পারলে আমাদের সম্পর্কে সব প্রমাণ বাংলাদেশ পুলিশ ঐক্যতে পাঠাবে। যেভাবেই হউক আমাদের ধ্বংস করবে। ওরা খুব ক্ষমতাশালী। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের সাথে তাদের চক্র শামিল আছে। আমরা সবাই এখন একটা ঝড়ে আছি। বিশেষ করে আমির আর ওর বাপ। তাই আমির এখানে এসেছে।

এক মাস শেষ হওয়ার আর বারোদিন বাকি। মেয়ে পাচার করতে হবে আটদিন পরই। মেয়ে যোগাড় হয়েছে নয় জন। যেভাবেই হউক আমাদের একুশটা মেয়ে লাগবেই। তাই এখন খুব চাপ। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে উপস্থিত তুমি!'
রিদওয়ান শব্দ করে হাসলো। তার হাসি যেন থামছে না। পদ্মজা তীক্ষ্ণ স্বরে বললো,'ধ্বংসের লক্ষণ শুরু হয়েছে। দুশো বছর চলেছে আর কত চলবে!'
'কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। আমিতো দেবই না। আমার জীবনে কিছু বলতে শুধু এই অংশটাই আছে। বেঁচে থাকার একটাই অংশ।'
'যে মেয়েগুলোকে মেরেছেন তাদের না মেরে পাচার করেই দিতে পারতেন। সেটা কেন করেননি?' পদ্মজার ভেতরে অপ্রতিরোধ্য তুফান চললেও। কণ্ঠ শান্ত। রিদওয়ান স্বাভাবিক স্বরেই জানালো,কেন তারা এই মেয়েগুলোকে

পাচার করতে পারছে না। মেয়েগুলো দুই মাস ধরে এখানে আছে। প্রথম পনেরো দিন বীভৎস ধর্ষণে এদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে,শরীরে বিভিন্ন দাগ বসে গেছে। তখন তারা জানতো না,তাদের মেয়ের অভাব পড়ে যাবে। তারপরও এক মাস ঔষধপত্র দিয়ে মেয়েগুলোর ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করেছে। হয়নি। তাই বিগত পাঁচদিন ধরে তারা তাদের রীতি অনুসারে মেয়েগুলিকে পিটাচ্ছে। আজ দুটো মেয়ে মারা গেছে। আগে লাশই ফেলে দেয়া হতো। পাঁচ বছর ধরে টুকরো,টুকরো করা হয়। এটাও আমিরের বুদ্ধি। যাতে কোনো মানুষের চোখে না পড়ে,আর পুলিশও শনাক্ত করতে না পারে। পুলিশরাও এখন চালাক হয়ে গেছে।

পদ্মজা বললো,'আমি মেয়ে পাচার করতে দেব না।'
'কী করবে?'

পদ্মজা নিশ্চুপ।
‘কিছুই পারবে না। আমির তোমাকে ছেড়ে দিলেও আমরা ছাড়ব না। আর আমিরও তোমাকে ছাড়বে না। ও তোমার শরীরে আকৃষ্ট। ভালোবাসে না। যেদিন তুমি রুম্পার ঘরে রাতে ছিলে সেদিন আমির তোমার খেয়াল রাখার জন্য না,তোমার উপর নজর রাখার জন্য রাতে ঘুমায়নি। রুম্পা কখন কী বলে দেয় সেই ভয়ে। রুম্পাকে খুন করার পরিকল্পনাও আমিরের। ও বাবলুকে পাঠায়। হাবলুর ভাই বাবলু। দুজনই বংশগত জাত খুনি। কিন্তু গিয়ে দেখে আলমগীর ভাইয়া তার বউকে নিয়ে পালাচ্ছে। তবুও বাবলুর সাথে ওরা পারতো না। সেখানে তুমি বাগড়া দাও। বাবলুকে খুন করে ফেলো! কী আশ্চর্য! একদম মায়ের রূপ পেয়েছো। পুরোটা দৃশ্য কিন্তু আমির দেখেছে। ও জঙ্গলে ছিল। এতো,এতো চিন্তার মাঝে তোমার এই রূপ! তুমি যখন পূর্ণাকে নিয়ে অন্দরমহলে

চলে যাও,তখন লাশ সরিয়ে দেয়া হয়। তুমি পূর্ণাকে নিয়ে ঘরে যাও তখন আমির তোমাদের ঘরে চলে যায়। এমনকি আমিরের জ্বরও হয়েছিল,মেয়ে যোগাড়ের চিন্তায়। এমন অবস্থায় তোমার খুনাখুনির কাজকর্ম আমিরকে পাগল করে তুলে। অস্থির হয়ে পড়ে। রানিকে খোঁজার নাম করে এখানে এসে পরিকল্পনা করে,তোমাকে ভয় দেখানোর। যাতে তুমি ঢাকা চলে যাও আমিরকে নিয়ে। ওর বিশ্বাস আটদিনে মেয়ে যোগাড় করে ফেলবে। কিন্তু এটা বিশ্বাস নেই যে, তুমি আট দিন পর ঢাকা যেতে রাজি হবে। তাই আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে। এমনকি তোমাকে মারতেও বলেছে। যাতে ভয় পাও। মারার পরও যখন ভয় পাওনি। তারপর বললো,তোমাকে রক্ত দেখাতে। যদিও একটা মেয়ের রক্ত দেখিয়েছিলাম তোমাকে। ওর বিশ্বাস ছিল,স্বামীর জানের মায়ায় হলেও ছেড়ে

দিবে এই গ্রাম। কিন্তু তুমিতো মুখের উপর বলে দিলে,ঢাকা ফেরত যেতে রাজি না তুমি। এই সত্যি তুমি আমিরকে ভালোবাসো? ভালোবাসা কী?’

পদ্মজা দাঁতে দাঁত চেপে চোখের জল ফেলছে। রিদওয়ান দুই হাত নাড়িয়ে বললো,’আচ্ছা,এসব ভালোবাসা-টালোবাসার কথা বাদ দেও। আমির তোমাকে ভালোবাসে না। সব ওর নাটক। ও তোমার রূপকেই ভালোবেসেছে। এখনও যে রূপের শরীর তোমার! আমিই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সেখানে তো ও হালালভাবে ভোগ করার সনদ পেয়েছে। সবশেষে, ভালোভাবে বলছি পদ্মজা। কোনো বাগড়া দিও না আর। সব মেনে নাও। নয়তো তোমাকে মরতে হবে। আমির না মারলেও বড় চাচা,আব্বা আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।’

‘তিনি কেন আমাকে মারবেন না? তিনিতো আমাকে ভালোবাসেন না।’
‘ভালো না বাসলেও টাকার প্রতি যেমন টান ওর তেমন সুন্দরের প্রতি টান আছে। ধরে রাখতে চাইতেও পারে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, অনেক করেছো আর কিছু করো না।’
‘কী পান এসব করে?’
‘অর্থ পাই। শান্তি পাই।’
‘মেয়েদের কষ্ট দিয়ে কীসের শান্তি? হাওলাদার বংশে ভালো ছেলে নেই? সবই খারাপ?’
‘যারা ভালো হয়েছে তারা মরেছে। তবে জাফর ভাই,আলমগীর এরা তো ভালো। এদের অনেক পিটিয়েও বড় চাচা,আব্বা এই পথে আনতে পারেনি। জাফর ভাইতো এই সম্পর্কে কিছুই জানে না। জাফর ভাই একটু বোকা ধরণের। অনেক স্পর্শকাতর মন। মুরগির রক্ত দেখলেই

অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই তাকে আর এই জগতে আনা হয়নি। আব্বার প্রথম ছেলে ছিল বলে মারেনি। রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয় পড়ার জন্য। তারপর বিয়ে করে বাইরেই চলে গেল। আর আলমগীর ভাইয়া বাধ্য হয়ে এই দলে কাজ করেছে। সুযোগ পেয়ে পালিয়েও গেছে। আমিরতো ছোট থেকেই তেজি। বড় চাচার কাছে আমির হচ্ছে সোনার টুকরা। এসব গল্প করতে ভালো লাগছে না। ঘাড়টা খুব ব্যথা করছে। এতো শক্ত আঘাত দিয়েছো। ডাইনি নাকি তুমি?’

রিদওয়ান আলতো করে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো,’আচ্ছা,আসল কথা বলি, আমিরকে ছেড়ে পালিয়ে যাও। এই রাজত্বে থাবা দেয়ার কথা ভেবো না। জীবনে কিছু পাইনি। মা জন্ম দিয়ে মারা গেল। বাপের অবৈধ সন্তান আমি। ছোট থেকে আমি

অত্যাচারিত। আজও আমির আমার উপর অত্যাচার করে। অনেক দূর্বল ছিলাম। পানিতে চুবিয়ে রেখেছে,শীতের রাতে উলঙ্গ করে বেঁধে রেখেছে। পিটিয়েছে। আমির মানুষকে আঘাত করতে পছন্দ করে। মানুষের আকুতি-মিনতি ওর কাছে পরম শান্তির। তুমি ওর কাছে থেকো না। পালিয়ে যাও। পুলিশের কাছে যেও না। অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। ও এখন মায়া দেখাচ্ছে। যখন স্বার্থে বেশি টান পড়বে ঠিকই হাত তুলবে। খুন করে ফেলবে তোমাকে।’

পদ্মজা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বললো,’ কি বলছেন! তাহলে উনি আপনার কাহিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন!’
রিদওয়ান পদ্মজার কথা বুঝতে পারলো না। সে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলো,’কিছু বললে?’
পদ্মজা কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। পিছনের ছয় বছর মিথ্যের

জাল দিয়ে প্যাঁচানো! কিছু সত্য নয়। সব মিথ্যে। সব!

আমির মাত্রই এসেছে। এখন শেষরাত। সে পানি খেয়ে রাফেদকে বললো,'নতুন মেয়ে তিনটাকে খেতে দিও। চিৎকার, চেঁচামেচি করলে ভুলেও মেরো না।'
রাফেদ বললো,'আপনি ভাববেন না। সব সামলে নেব।'
আমির বিটু(B2) ঘরে বসে রয়েছে। মজিদ বললো,'আমরা যাই তাহলে। সকালে কাজ আছে আমার।'
আমির কিছু বললো না। কপাল কুঁচকে রেখেছে। সিগারেট ধরালো। খলিল বললো,'ওই ছেড়িরে এহন কী করবি?'
আমির বললো,'এটা আমার ব্যাপার।
আরভিদ?' উঁচু স্বরে ডাকলো।
আরভিদ সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে আসলো।

আমির বললো,’বাড়ির পিছনে যাও। লতিফা থাকবে। যা দিবে নিয়ে আসবে।’
আরভিদ চলে গেলো। আমির চেয়ারে বসে মজিদকে বললো,’গেলে যাও। দাঁড়িয়ে আছো কেন? শফিক না আসছিল,কোথায় গেল?’
‘রিদুর কাছে গেছে।’ বললেন খলিল। তারপর মজিদরে বললেন,’আইয়ো ভাই। বাড়িত যাই।’

পদ্মজা ক্লান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো,’ঢাকার অফিস আর গোডাউনে আমি তো অনেকবার গিয়েছি। সেখানে পণ্য দেখেছি। মেনু দেখেছি। কিছুতো মিথ্যে মনে হয়নি।’
‘আমিরের সত্যি পণ্যের ইমপোর্ট ব্যবসা আছে। ও কাঁচা কাজ করে না।’
‘আর আমার মেয়ে? আমার নিষ্পাপ তিন মাসের মেয়েটাকে কে খুন করেছে? বাবলু করেছে?’
রিদওয়ান এই প্রশ্নে থমকায়। পদ্মজা অধীর

আগ্রহে তাকিয়ে আছে এই প্রশ্নের জবাবের জন্য। দরজায় টোকা পড়ে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে প্রবেশ করলো একটা চেনা মুখ।
রিদওয়ান হেসে বললো,'আরে শফিক। শেষরাতে এখানে?'
শফিক পদ্মজাকে জহুরি চোখে দেখলো। শফিকের এলোমেলো চুল,নোংরা চাহনি। সে রিদওয়ানকে বললো,'হু,আসছি। আগে বল,আমিরের বউ এখানে কেন? এই মেয়েরেও চালান করে দিবে নাকি?'
'নিজে নিজেই চলে এসেছে। কোনো বিপদ? থানার কী অবস্থা?'
'তোরা কি আজমপুর থেকে কোনো মেয়ে এনেছিস? আজমপুরের মাতব্বর মামলা করেছে। তার মেয়ে হারিয়ে গেছে। বিশাল বড়লোক। বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপার তো জানিসই। আশেপাশের সব এলাকাতেই খোঁজ চলছে। আগামীকাল অলন্দপুরেও পুলিশ

আসবে। তাই তোদের জানাতে এসেছি। সাবধানে থাকিস।’
‘দুনিয়ার সব ভেজাল একসাথে এইবারই আসতেছে।’ ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো রিদওয়ান।

শফিক তার গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে পদ্মজাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখলো। তারপর পদ্মজার পায়ের কাছে বসলো। পদ্মজার ফর্সা পা দুটিতে তার নজর পড়ে। পায়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বললো,’খুব সুন্দরী। কাছ থেকে প্রথম দেখলাম। মেরেই তো দিবে নাকি?’
শফিকের ছোঁয়া যেন পদ্মজার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল। সে হুংকার ছাড়লো,’ একদম ছোঁয়ার চেষ্টা করবেন না। দূরে সরুন।’
শফিক অবাক হয়ে রিদওয়ানকে বললো,’আরে

এর তো তেজ অনেক। আমির সামলায় কেমনে?’

রিদওয়ান ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকিয়ে রেখেছে। তার সাহস হচ্ছে না পদ্মজাকে ছোঁয়ার। কিন্তু অন্য কেউ আমিরের দূর্বলতায় হাত দিচ্ছে দেখে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। সে শুধু দৃশ্যটা উপভোগ করছে। শফিক শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললো,’এতো সুন্দর মেয়ে হাতছাড়া করা যায় না। মেরেই যখন দেয়া হবে একটু উপভোগ করে দেখি কী বলিস?’

পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। শেষমেশ তার ইজ্জতেও হাত পড়ছে। সে ছটফট করতে থাকে ছোটার জন্য। পদ্মজা বাঁধা অবস্থায় উল্টা হয়ে ছিল। শফিক সোজা করে। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার মসৃণ,পাতলা পেট উন্মুক্ত হয়ে উঠে। শফিকের লোলুপ দৃষ্টি দেখে পদ্মজার শরীর রি

রি করে উঠে। সে প্রাণপণে ছোটার চেষ্টা করছে। শফিক উল্লাসে বললো,' আরে ভাই, এমন সুন্দর মেয়েমানুষ তো দুটো দেখেনি। আমিরের উচিত ছিল আমাদের সাথে ভাগ করে নেয়া। একাই ছয় বছর – আচ্ছা যাক। তুই এখানে বসে থেকে দেখবি? দেখলে দেখতে পারিস।'

শফিক আরো অশ্লীল মন্তব্য করে। যা শুনে পদ্মজার ঘৃণায় বুক ফেটে কান্না আসে। শফিক পদ্মজার উপর ঝুঁকতেই পদ্মজা চেঁচাতে থাকে। এক দলা থুথু ছুঁড়ে দেয় শফিকের মুখের উপর। শফিকের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। প্রবল আক্রোশে পদ্মজার আহত গালে থাপ্পড় বসায়। পুরনো ক্ষতস্থানের পুরো চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ব্যথায় পদ্মজার সারা শরীর টনটন করে উঠে। আর্তনাদ করে উঠে 'আম্মা' বলে। তখনই দুটি পায়ের শব্দ ভেসে আসে।

কেউ একজন দৌড়ে এদিকে আসছে।
রিদওয়ান আমিরের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। ঘরে এসে প্রবেশ করলো আমির। রিদওয়ানের ধারণাই সত্যি। আমির পদ্মজার চিৎকার শুনেই চলে এসেছে। আমির এখানে আছে জানলে রিদওয়ান শফিককে নিষেধ করতো। শফিকও তো বলেনি! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়!

শফিক আমিরকে দেখে হাসলো।
বললো,'আমির এই বউ তো-

চোখের পলকে সেই হাসি মিলিয়ে যায়। কথা বলাও থেমে যায়। আমির থাবা মেরে ধরে শফিককে। রিদওয়ান দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এটু(A2) ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। শফিক কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আমির ছুরি দিয়ে শফিকের গলার রগ কেটে ফেলে। রক্ত

ছিটকে পড়ে পদ্মজার উপর। আমির নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে শফিকের দুই চোখে আঘাত করে। পেটে,বুকে আঘাত করে। শফিকের মাথা দুই হাতে ধরে দেয়ালে শব্দ তুলে আঘাত করে। শফিকের মুখ থেকে গ্যার-গ্যার ধরণের একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। সেই শব্দ আর আমিরের বিশ্রি গালিগালাজে পদ্মজা ভীত হয়ে পড়ে। রক্তে সারা ঘর রক্তপুরী হয়ে উঠেছে। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। সে কখনো আমিরকে খুন করতে দেখেনি। আজই প্রথম দেখছে। কী নির্মম তার খুন করার ধরণ। কী হিংস্র তার চাহনি,তার আক্রমণ! চোখের পলকে মানুষ খুন করে ফেলেছে! পদ্মজা চোখ বুজে জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো।আমিরের সারামুখে রক্ত। চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাপাচ্ছে না। দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো মজিদ,খলিল,রাফেদ,আরভিদ।

মুহূর্তে চারিদিক থমকে যায়। থেমে যায় সব শব্দ। শফিকের রক্তাক্ত দেহটি মেঝেতে পড়ে আছে। চোখ দুটি যেন বেরিয়ে এসেছে। গলার রগ থেকে ছিটকে রক্ত বের হচ্ছে। যেকোনো সাধারণ মানুষের কাছে এই দৃশ্য দেখা মানে ওই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করা। গড়গড় করে বমি করা। পদ্মজার সারা শরীর কাঁপছে। এমন মানুষের সাথে সে কিছুতেই পারবে না। মুহূর্তের ঘটনায় সে হার মেনে নিয়েছে। মনেপ্রাণে নিজের মৃত্যু চাইছে। এই মুহূর্তে মনে ভয় ছাড়া আর কিছু নেই।ভালোবাসা,রাগ,ঘৃণা,ক্রোধ কিছু নেই। সে শুধু ভয় পাচ্ছে।

চলবে...